

ম্যারিটাল কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে দম্পতিদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের সমাধান সম্ভব

মানসিক সুস্থান্ত আমাদের কতটা জরুরি? মানসিক চাপের সঙ্গে এর সম্পর্ক কী?

মানসিক স্বাস্থ্যকে ঠিক না রাখলে আমাদের শারীরিক সুস্থাস্থ্য বা সার্বিক স্বাস্থ্য বজায় রাখা কঠিন। দীর্ঘদিনের উদ্বেগ, মানসিক চাপ বা অন্য কোনও মানসিক অসুস্থতা অনেক ধরনের শারীরিক অসুস্থতা ডেকে আনতে পারে। মানসিক চাপ বা পীড়ন বলতে আমরা বুঝি, কোনও বাহ্যিক পীড়ক বা চাপ উদ্বেককারী ঘটনা বা ঘটনাসমূহকে আমরা যুক্ততে পারি না এবং পীড়নের সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পারার কারণে আমরা মানসিক চাপ অনুভব করি। আমরা যদি মানসিক চাপের কারণ, প্রকৃতি বুঝে উঠতে পারি এবং তার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার উপযুক্ত কোপিং স্ট্র্যাটেজি গড়ে তুলতে পারি, তাহলে তা অনেকাংশে আমাদের মানসিক চাপ কমাতে সম্ভব। সর্বোপরি আমাদের সার্বিক সুস্থাস্থ্য বা ভালো থাকাকে সুনিশ্চিত করে।

অনেকেরই মুড সুইং করে। যার নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে, কাজকর্মের ওপর পড়ে। মুড সুইং-এর কারণ কী? এর নেতিবাচক দিক থেকে কীভাবে বেরিয়ে আসা যায়?

মুডের ওঠানামা বা মেজাজগত পরিবর্তন এখনকার এই দ্রুতগতির জীবনে খুব স্বাভাবিক একটি ঘটনা। সামাজিক সম্পর্কের চাপ, কাজের ডেডলাইন, পারিবারিক দ্বন্দ্ব বা অন্যান্য চাপ, তার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া, রিয়েল লাইফের এবং সামাজিক মাধ্যমের অবাস্তব মাপকাঠির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা— এইসবই মেজাজগত পরিবর্তনের কারণ হতে পারে। সুস্থ জীবনযাত্রার অভাব, নিদ্রাহীনতা, নিয়ন্ত্রণহীন খাদ্যাভ্যাস, মদ্যপান বা অন্য কোনও নেশাদ্রব্য সেবনকেও আমরা এর কারণ হিসেবে ধরতে পারি। এছাড়াও কিছু মনস্তাত্ত্বিক কারণ, যার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, মানসিক চাপের সঙ্গে ঠিকভাবে অভিযোজন করতে না পারা বা কোপিং স্ট্র্যাটেজির অভাব, ব্যক্তিত্বের সমস্যা— এগুলিও কারণ হতে পারে। এছাড়াও খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক হল, জৈবিক কারণ। ব্রেনের নানা নিউরোট্রান্সমিটারের ভারসাম্যের অভাব, মহিলাদের ক্ষেত্রে হরমোনের অধিক বা ঘাটতি, এমনকি থাইরয়েডের মতো নিউরোএন্ডোক্রাইন হরমোনের সমস্যাও মেজাজগত পরিবর্তনের একটি প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। কাম ও ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মুডের পরিবর্তন ডিপ্রেশন, বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডার, অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারের সূচক হতে পারে। সেই বিষয়ে ডাক্তার ও মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শদাতার পরামর্শদান খুব জরুরি।

কার্পেটেট অফিসে, গ্রুফেকশনাল জগতে নানারকম ওঠাপড়া সারাক্ষণ লেগে থাকে। কী করে নিজেকে মানসিক ভাবে চান্স রাখা যাবে, এই বিষয়ে সংক্ষেপে জানতে চাই।

সব ধরনের মানসিক চাপ সামলে সুস্থর এবং সন্তোষজনক জীবনযাপনের জন্য আমাদের মেটাল হাইজিন অভ্যাস করা জরুরি। আমাদের মনের যত্ন নিতে রোজ মাইন্ডফুলনেস, মেডিটেশন, রিলাক্সেশন ব্রিথিং বা যেকোনও ধরনের রিলাক্সেশন পদ্ধতি অভ্যাস করা, যা আমাদের স্ট্রেস হরমোনকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। নিয়মিত যোগব্যায়াম বা দৈহিক অঙ্গসঞ্চালন আমাদের ব্রেনের কিছু নিউরোট্রান্সমিটারের (হ্যাপি হরমোন) অধিক ঘটাে। প্রত্যেক দিন সুস্থম আহার গ্রহণ, পর্যাপ্ত ঘুম জরুরি মানসিক সুস্থাস্থ্যের জন্য। তা ছাড়াও প্রত্যেক দিন নিজের সঙ্গে সময় কাটানো, নিজের পছন্দের কোনও কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকা, জার্নালিং করা আমাদের অনেকটাই ভালো রাখতে সাহায্য করে। প্রতিদিন জার্নালিংয়ের সময় সারাদিনের কাজের প্লান, কত ঘটনা কাজ করা, এগুলো আগে থেকে ঠিক রাখা, যাতে আমরা বেশি সময় কাজ না করে ফেলি, আবার



প্রতি চক্রবর্তী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত মনোবিজ্ঞান বিভাগে গবেষণারত, জড়িত অধ্যাপনার সঙ্গেও। আলাপচারিতায় বাসব মৈত্র।

প্রত্যেক দিনের টার্গেট আমরা সুষ্ঠুভাবে সেের ফেলতে পারি। সবশেষে, সারাদিন থেকে কী শিখলাম, সেই রিফ্লেকশনের জায়গাটা যদি আমরা ভেবে একটু লিখে রাখতে পারি, তাহলে তা আমাদের মানসিক বিকাশে সাহায্য করে। **আমাদের দেশে আত্মহত্যার সংখ্যা যেন দিন দিন বাড়ছে। বিভিন্ন বয়সের মানুষ আত্মহত্যা করেন। কোন মানসিক অবস্থায় এই আত্মহত্যা করার প্রবণতা দেখা দেয়?** আত্মহত্যা হল প্রবল মানসিক চাপ ও পীড়ন সহ্য করতে না পেরে বাস্তব ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার চরমতম রূপ। এখানে মানুষ মনে করেন যে তার নিজেকে শেষ করে দেওয়া উচিত, কারণ তিনি কারও কাছেই আর মানসিকভাবে পৌঁছতে পারছেন না। ধীরে ধীরে পরিবার, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবের থেকে এই যে বিচ্ছিন্নতা ও হতাশা, তা আত্মহত্যার কারণ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। এর প্রধান কারণ চিন্তাভাবনার অসংগতি বা **cognitive distortion**। অনেক সময় কোনও শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতা থাকলে, ব্যক্তি নিজেকে পরিবারের একটি বোঝা মনে করতে পারেন, ফলস্বরূপ আত্মহত্যার চিন্তা বা **suicidal ideation** আসতে পারে। অনেকেই আবার বোঁকের বশে এবং **impulse control**-এর অভাবে আত্মহত্যা করে থাকেন। তাঁদের অনেকেই হয়তো মানসিক রোগের শিকার। বয়স্কদের ক্ষেত্রে নিজেকে অকর্মণ্য ভাবলে বা কর্মক্ষমতা কমে গেলেও এমন চিন্তাভাবনা আসতে পারে। যদি মানসিক স্বাস্থ্য বা আত্মহত্যা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়, তাহলে নিশ্চিতভাবে এটি কমানো যায়। এখন অনেক হেল্পলাইন নম্বর রয়েছে, যেখানে ফোন করলে তৎক্ষণাৎ পীড়িত ব্যক্তিকে সহায়তা প্রদান করা হয়। কারও সাইকোথেরাপিস্ট থাকলে তার সঙ্গে তৎক্ষনি যোগাযোগ করা বা পরিচিত কোনও ব্যক্তি বা বন্ধুর সংস্পর্শে আসা। সাইকোথেরাপি চললে থেরাপিস্ট বুঝতে পারেন মানুষটির অসহায়তার জায়গাগুলো কোথায়। পরবর্তীতে সেগুলো নিয়ে কাজ করে **cognitive restructuring** করে এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসা যায়।

সম্প্রতি একজন বিখ্যাত বাঙালি চিত্রপরিচালক আত্মহত্যা করলেন। সফল জনপ্রিয় পরিচালক। সংকুতি জগতে এরকম বহু আত্মহত্যার উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে সারা পৃথিবীতে। সফল মানুষ কেন আত্মহত্যা করেন? এর থেকে মুক্তির উপায় কী?

সফল মানুষের থেকেও যেসব মানুষ সৃজনশীল হন, যাদের মধ্যে শিল্পীসত্তা বর্তমান, তারা অনেকেই আত্মহত্যাপ্রবণ হয়ে পড়েন। কেউ ছবি আঁকেন, কেউ সিনেমা বানান বা কেউ গান করেন, তাঁদের সবার মধ্যে প্রাক্ফোডিক সংবেদনশীলতা খুব বেশি থাকে। এটি একদিকে যেমন সৃজনশীলতায় সাহায্য করে, তেমনি কিছু ক্ষেত্রে এটি তাঁদের মানসিক সুস্থাস্থ্যের পরিপন্থী। এই মানুষদের বুদ্ধি বা সৃজনশীলতা, চিন্তাভাবনা এবং আবেগের গভীরতা বেশি থাকলেও, তারা তাঁদের আবেগকে ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। এই ধরনের ব্যক্তি যদি একটু সচেতন হন নিজেকে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে বা তাঁর কোনও মানসিক অসুস্থতা বা অতীহিক মৃত্যুচিন্তা আসে, তাহলে ডাক্তারের ও মনোবিদের পরামর্শ নিয়ে চিকিৎসা করানো আবশ্যিক।

বিবাহবিচ্ছেদ নারী আর পুরুষের মনকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

বিবাহ একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বিবাহবিচ্ছেদের সবচেয়ে বড় প্রভাব হল তার সামাজিক অভিঘাত। এত বছরের সম্পর্ক ও বিবাহসূত্রে তৈরি হওয়া অন্যান্য সম্পর্কগুলির থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া খুবই বেদনাদায়ক। অনেকের এক্ষেত্রে ট্রমা রেসপন্স তৈরি হয়, কারণ আমাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ফলে আমাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানসিক নিরাপত্তা প্রস্রাচিহ্নের মুখে পড়ে। সেখান থেকেই হতাশা, উদ্বেগ, অবসাদ, পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার দেখা দিতে পারে। অনেক মানুষই এই বিচ্ছেদের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য মলদক্ষবোর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। বিবাহবিচ্ছেদের এই ক্রমাগত মানসিক চাপ, সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার হতাশা অনেক মানসিক অসুখকে ডেকে আনতে পারে। সন্তান থাকলে তার ওপর আরও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। মহিলাদের এর সঙ্গে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সামাজিক অভিঘাতের সঙ্গে লড়তে হয়, যা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের একটি বৈশিষ্ট্য। মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে নানান সিগমা বা কুসংস্কার থাকায় অনেকেই পরামর্শ নেওয়ায় এগিয়ে আসেন না। ফলে জটিলতা বাড়ে। কাল কালুসেলিং বা ম্যারিটাল কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে দম্পতিদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের সমাধান সম্ভব।

আগেকার মানুষের তুলনায় এখনকার মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা অনেকটাই বেড়েছে। সঙ্গে বেড়েছে মানুষের লোভ, দীর্ঘা, হিংস্রতা। কীভাবে মানুষ নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করবেন এই সবার থেকে?

আমাদের মনের মধ্যে যখন কোনও অন্তর্দ্বন্দ্ব বা নিরাপত্তাহীনতা কাজ করে, আমরা মনে করি যে কোনও পার্থিব জিনিস সংগ্রহ করলে আমার আনন্দ বেশি হবে। সেখান থেকেই লোভ জন্ম নেয়। কারণ সেটা আমাদের মস্তিষ্কের ‘reward circuit’-কে প্রভাবিত করে। ‘satiation mapping’-এর মাধ্যমে আমরা বোঝার চেষ্টা করি, কোনও নির্দিষ্ট দিনের জন্য বিরত থাকা, যদি তা তৎক্ষনি প্রয়োজনীয় না হয়। দীর্ঘা তখন হয়, যখন আমার পরিচিত কেউ বা আমার সমকক্ষ আমার থেকে এগিয়ে যায়। দীর্ঘা সবসময়ই আমাদের কাছে একটা খ্রৌঁ দিতে পারে। কারণ আমরা অন্যের সফলতা দেখে নিজের ব্যোধ্যতা নিয়ে সদিহান হয়ে পড়ি ও ভয় পেতে থাকি। সেখান থেকে উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা হয়। আমরা যদি এই তুলনা অন্যের সঙ্গে না করে নিজেরদের কাজের সঙ্গেই নিজের তুলনা করতে পারি, তাহলে আমরা নিজেরের উন্নয়ন সংস্করণ হয়ে উঠতে পারব।

hemorrhoidopathy এবং **Laser hemorrhoid surgery**—ও ব্যবহৃত হচ্ছে, যা তুলনামূলক কম ব্যাঘাত্যুক্ত এবং দ্রুত আরোগ্য প্রদান করে। তবে কোন পদ্ধতি প্রযোজ্য হবে তা রোগীর অবস্থা অনুযায়ী সার্জন নির্ধারণ করেন।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—সব মলদ্বারজনিত রক্তপাতই পাইলস নয়। **Anal fissure, fistula, inflammatory bowel disease** এমনকি **colorectal malignancy**-ও হতে পারে। তাই **Self-medication** না করে সঠিক পরীক্ষা অত্যন্ত জরুরি।

প্রতিরোধের জন্য পরিবারে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস হতে অন্তিমা দরকার। শিশুদের ছোটবেলা থেকেই আঁশযুক্ত খাবার খাওয়ানোর অভ্যাস করতে হবে। পর্যাপ্ত জল পান এবং নিয়মিত শারীরিক কার্যকলাপ নিশ্চিত করতে হবে।

ওজন নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধূমপান ও অতিরিক্ত আলকোহল গ্রহণও অন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যকলাপে প্রভাব ফেলে। তাই এগুলো বর্জন করা উচিত। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং দীর্ঘদিন কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। অনেক রোগী লজ্জায় বছরের পর বছর রক্তচিৎসা নেন না। ফলে একটি ছোট সমস্যা বড় জটিলতায় রূপ নেয়। মনে রাখতে হবে, পাইলস একটি সাধারণ চিকিৎসাযোগ্য রোগ। প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা নিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপারেশন ছাড়াই নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। সুস্থ অঙ্গ মানুষের জীবন। আমাদের দৈনন্দিন অভ্যাসের সামান্য পরিবর্তনই পাইলসের মতো সমস্যাকে পান্থ অধিক্রান্তে পরিণত করতে পারে। আঁশযুক্ত খাদ্য, পর্যাপ্ত জল, নিয়মিত ব্যায়াম এবং সময়মতো চিকিৎসা—এই চারটি বিষয় মেনে চললে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাইলস থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব। লজ্জা নয়, সচেতনতা হোক প্রথম নদক্ষেপ। রোগকে লুকিয়ে না রেখে সঠিক সময়ে চিকিৎসা নিন। সুস্থ থাকুন।

পাইলস বা হেমোরয়েডস

লজ্জার রোগ নয়, অবহেলার ফল মারাত্মক হতে পারে

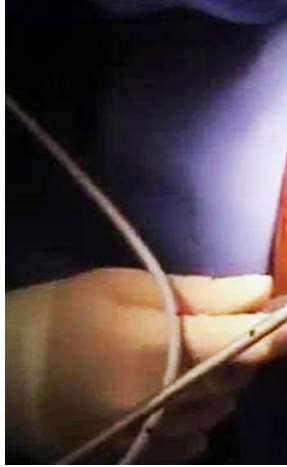
উত্তর-পূর্ব ভারতের বহু

ভূগর্হেন যা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে সংকেচ বোধ করেন। সেই সমস্যার নাম পাইলস বা **Hemorrhoids**। অনেকেই এটিকে সামান্য সমস্যা মনে করেন, কেউ আবার লজ্জায় চিকিৎসকের কাছে যান না। ফলস্বরূপ রোগটি জটিল আকার ধারণ করে। একজন চিকিৎসক হিসেবে প্রতিদিন আমি দেখছি—অবহেলা, ভুল ধারণা এবং সেরিতে চিকিৎসা নেওয়ার কারণে সাধারণ পাইলস কখনও কখনও মারাত্মক জটিলতায় রূপ নিচ্ছে। এই প্রবন্ধে সাধারণ মানুষের জন্য সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি—পাইলস কী, কেন হয়, এর সম্ভাব্য জটিলতা কী এবং কীভাবে প্রতিরোধ ও চিকিৎসা সম্ভব।

পাইলস বা **Hemorrhoids** হলো মলদ্বারের ভেতরের বা বাইরে অবস্থিত শিরা বা **venous plexus**-এর অস্বাভাবিক স্ফীতি। সহজভাবে বললে, এটি হলো মলদ্বারের রক্তনালীর ফুলে যাওয়া। দীর্ঘদিন কোষ্ঠকাঠিন্য, অতিরিক্ত চাপ দিয়ে মলত্যাগ, দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা, স্থূলতা এবং কম আঁশযুক্ত খাদ্যাভ্যাস এর প্রধান কারণ।

পাইলস সাধারণত দুই ধরনের—**Internal hemorrhoids** এবং **External hemorrhoids**। **Internal hemorrhoids** মলদ্বারের ভেতরে থাকে এবং প্রাথমিক পর্যায়ে বাহ্যহীন রক্তপাত হতে পারে। **External hemorrhoids** মলদ্বারের বাইরে হয় এবং প্রায়শই ব্যথা, চুলকনি ও ফোলাভাব সৃষ্টি করে। কখনও কখনও **thrombosed hemorrhoid** হয়, যেখানে রক্ত জমাট বেঁধে তীব্র ব্যথা তৈরি হয়। রোগটি ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়।

Internal Hemorrhoids সাধারণত চারটি গ্রেডে ভাগ করা হয়। প্রথম গ্রেডে শুধুমাত্র রক্তপাত হয়, দ্বিতীয় গ্রেডে মলত্যাগের সময় বেরিয়ে এসে আবার নিজে থেকেই ভেতরে চলে যায়, তৃতীয় গ্রেডে হাতে



ঠেলে ভেতরে ঢোকাতে হয়, আর চতুর্থ গ্রেডে স্থায়ীভাবে বাইরে বুলে থাকে এবং সহজে ভেতরে যায় না। এই অবস্থায় সংক্রমণ, আলসারেশন এবং তীব্র ব্যথা হতে পারে। পাইলসের প্রধান লক্ষণ হল মলত্যাগের সময় উজ্জ্বল লাল রক্তপাত। অনেক রোগী মনে করেন এটি ক্যান্সারের লক্ষণ কিনা। সব রক্তপাত ক্যান্সার নয়, তবে ৪০ বছরের বেশি বয়সে নতুন রক্তপাত হলে অবশ্যই **Colonoscopy** বা **Proctoscopic examination** প্রয়োজন, যাতে **Colorectal cancer**-এর সম্ভাবনা বাদ দেওয়া যায়। কোষ্ঠকাঠিন্য পাইলসের প্রধান কারণ। আমাদের অঞ্চলে অতিরিক্ত সাদা ভাত, কম সবজি ও ফল খাওয়ার অভ্যাস, পর্যাপ্ত জল না পান করা এবং কম শারীরিক পরিশ্রমের ফলে **Chronic constipation** দেখা যায়। দীর্ঘদিন স্থূল মল ত্যাগ করতে গিয়ে মলদ্বারের শিরাগুলোতে চাপ পড়ে এবং ধীরে ধীরে সেগুলো স্ফীত হয়ে ওঠে। দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা—বিশেষ করে অফিসে, গাড়িতে বা বাড়িতে—পেলভিক অঞ্চলে রক্তসঞ্চালন কমিয়ে দেয় এবং শিরায় চাপ বাড়ায়। **Sedentary lifestyle** তাই পাইলসের অন্যতম ঝুঁকির কারণ। স্থূলতা, গর্ভাবস্থা এবং ভরী ওজন তোলা পেশাজীবীরাও ঝুঁকির মধ্যে

থাকেন। গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে জরায়ুর চাপ এবং হরমোনাগ পরিবর্তনের কারণে শিরা প্রসারিত হয়, ফলে পাইলসের প্রবণতা বাড়ে। অনেক ক্ষেত্রে প্রসবের পর সমস্যা কমে যায়, তবে কখনও স্থায়ী হয়ে যেতে পারে। পাইলসের জটিলতা অবহেলা করলে গুরুতর হতে পারে। দীর্ঘদিন রক্তপাত হলে **Iron deficiency anemia** হতে পারে, যার ফলে দুর্বলতা, মাথা ঘোরা এবং শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। **Thrombosed hemorrhoid** তীব্র ব্যথা সৃষ্টি করতে পারে। **Strangulated hemorrhoid**-এ রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে টিস্যু ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সংক্রমণ হলে পুঁজ জমা এবং **abscess** পর্যন্ত হতে পারে। চিকিৎসা না করেই প্রথম ও প্রধান ঝাপ হলো **Lifestyle modification**। প্রতিদিন অন্তত ২৫ থেকে ৩০ গ্রাম **dietary fiber** গ্রহণ করা উচিত। সবজি, ফল, ওটস, গোটা শস্য এবং ডাল খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পান করা এবং অত্যন্ত জরুরি—প্রতিদিন অন্তত ২ থেকে ৩ লিটার।

নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম অন্ত্রের গতিশীলতা বাড়ায় এবং কোষ্ঠকাঠিন্য কমায়। প্রতিদিন ৩০ মিনিট **brisk walking** অত্যন্ত উপকারী। দীর্ঘক্ষণ একটানা বসে থাকা এড়িয়ে চলা উচিত। অফিসে কাজের মাঝখানে প্রতি এক ঘণ্টায় অন্তত পাঁচ মিনিট হাঁটা বা দাঁড়ানো অভ্যাস করুন। মলত্যাগের সময় অতিরিক্ত চাপ দেওয়া উচিত নয়। দীর্ঘক্ষণ ট্যালেটে বসে মোবাইল ব্যবহার করার অভ্যাস ফস্টিকর। মলত্যাগের বোগ এলে দেরি না করে তা সম্পন্ন করা উচিত। প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসায় **Stool softener, bulk-forming laxative topical ointment** ব্যবহার করা হয়। **Sitz bath**—অর্থাৎ কুসুম গরম জলে ১০ থেকে ১৫ মিনিট বসে থাকা—ব্যথা ও অস্বস্তি কমাতে সাহায্য করে। কিছু ক্ষেত্রে **flavonoid group**-এর ওষুধ শিরার স্ফীতি কমাতে সহায়ক হতে পারে। যদি ওষুধ উপকার না হয়, তাহলে **Non-surgical procedure** প্রয়োগ করা হয়। **Rubber band ligation** একটি প্রচলিত পদ্ধতি যেখানে অভ্যন্তরীণ পাইলসের গোড়ায় ব্যান্ড লাগিয়ে রক্ত সরবরাহ বন্ধ করা হয়। **Sclerotherapy**-তে একটি রাসায়নিক পান্থ অধিক্রান্ত করে শিরা সঙ্কুচিত করা হয়। **Infrared coagulation** পদ্ধতিও কিছু ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। উন্নত পর্যায়ে বা জটিল অবস্থায় সার্জারি প্রয়োজন হতে পারে। **Conventional hemorrhoidectomy** দীর্ঘদিনের প্রমাণিত পদ্ধতি। বর্তমানে **Stapled**

হতে পারে। তাই **Self-medication** না করে সঠিক পরীক্ষা অত্যন্ত জরুরি। প্রতিরোধের জন্য পরিবারে স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস হতে অন্তিমা দরকার। শিশুদের ছোটবেলা থেকেই আঁশযুক্ত খাবার খাওয়ানোর অভ্যাস করতে হবে। পর্যাপ্ত জল পান এবং নিয়মিত শারীরিক কার্যকলাপ নিশ্চিত করতে হবে। ওজন নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ধূমপান ও অতিরিক্ত আলকোহল গ্রহণও অন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যকলাপে প্রভাব ফেলে। তাই এগুলো বর্জন করা উচিত। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং দীর্ঘদিন কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। অনেক রোগী লজ্জায় বছরের পর বছর রক্তচিৎসা নেন না। ফলে একটি ছোট সমস্যা বড় জটিলতায় রূপ নেয়। মনে রাখতে হবে, পাইলস একটি সাধারণ চিকিৎসাযোগ্য রোগ। প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা নিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপারেশন ছাড়াই নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। সুস্থ অঙ্গ মানুষের জীবন। আমাদের দৈনন্দিন অভ্যাসের সামান্য পরিবর্তনই পাইলসের মতো সমস্যাকে পান্থ অধিক্রান্তে পরিণত করতে পারে। আঁশযুক্ত খাদ্য, পর্যাপ্ত জল, নিয়মিত ব্যায়াম এবং সময়মতো চিকিৎসা—এই চারটি বিষয় মেনে চললে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাইলস থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব। লজ্জা নয়, সচেতনতা হোক প্রথম নদক্ষেপ। রোগকে লুকিয়ে না রেখে সঠিক সময়ে চিকিৎসা নিন। সুস্থ থাকুন।

প্যাকেটজাত খাবার ও শিশুর স্থূলতা: এক বাড়ন্ত সমস্যা

ভূমিকা: আধুনিকতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা বিপদ

বর্তমান সময়ে আমাদের শিশুদের বেড়ে ওঠার পরিবেশ দ্রুত বদলাচ্ছে। একদিকে প্রযুক্তির অগ্রগতি, অন্যদিকে খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন— এই দুইয়ের সংমিশ্রণে তৈরি হয়েছে এক নতুন জীবনযাত্রা। কিন্তু এই পরিবর্তনের মধ্যেই নিশ্চন্দ্রে প্রবেশ করেছে এক গুরুতর স্বাস্থ্যসমস্যা— শিশুদের স্থূলতা (Childhood Obesity)।

আগে যেখানে শিশুর অপুষ্টি ছিল প্রধান উদ্বেগ, এখন তার পাশাপাশি আরেকটি চ্যালেঞ্জ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে—অতিরিক্ত পুষ্টি বা “over-nutrition”। আর এই সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে প্যাকেটজাত ও প্রক্রিয়াজাত খাবারের বাড়বাড়ন্ত।

সমস্যা কতটা গুরুতর? জাতীয় ও ত্রিপুরার চিত্র

ভারতের বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে—

স্থূলগামী শিশুদের মধ্যে স্থূলতার হার প্রায় ৬-৮%। এবং অতিরিক্ত ওজন-সহ মোট সংখ্যা আরও বেশি।

শহরাঞ্চলে এই হার ১৫-৩০% পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে।

তারতের বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে—

স্থূলগামী শিশুদের মধ্যে স্থূলতার হার প্রায় ১১-২২% শিশু অতিরিক্ত ওজন-সহ ৩-৩% শিশু স্থূলতায় ভুগছে।

এগুলো হারতো খ্যাংযায় ছোট মনে হতে পারে, কিন্তু এই হার দ্রুত বাড়ছে—যা ভবিষ্যতে বড় বিপদের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

প্যাকেটজাত খাবার: “স্বাদের ফাঁদে” লুকিয়ে থাকা বিপদ

প্যাকেটজাত খাবার কেন এত ক্ষতিকর?

১. অতিরিক্ত চিনি: চকলেট, কোন্ড ভিক্‌স, প্যাকেট জুস—এসব খাবারে থাকে

“hidden sugar”, যা শিশুর অজান্তেই অতিরিক্ত ক্যালোরি যোগ করে।

২. ট্রান্স ফ্যাট ও স্যাচুরেটেড ফ্যাট: চিপস, বিস্কুট, ফাস্ট ফুড—এসব

খাবার শরীরে খারাপ কোলেস্টেরল বাড়ায়।

৩. উচ্চ লবণ: প্রক্রিয়াজাত খাবারে অতিরিক্ত সোডিয়াম থাকে, যা ভবিষ্যতে উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়ায়।

৪. ভিট্রেশন ও উদ্বেগ: এই খাবারগুলোতে প্রয়োজনীয় ভিটামিন, মিনারেল, ফাইবার প্রায় অনুপস্থিত।

ফলে শিশু পোট ভার্গলে ও শরীর সঠিক পুষ্টি পায় না—এবং ধীরে ধীরে

স্থূলতার দিকে এগোয়।

WHO নির্দেশিকা: সুস্থ শিশুর জন্য কী প্রয়োজন?



ডাঃ সায়ন কুমার দাস

শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ, TMC & Dr BRAM Teaching Hospital

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) শিশুদের সুস্থ রাখার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছে।

দৈনিক মোট ক্যালোরির ১০%-এর কম চিনি।

প্রক্রিয়াজাত ও জাঙ্ক ফুড সীমিত রাখা।

প্রতিদিন অন্তত ৬০ মিনিট শারীরিক কার্যকলাপ।

স্ক্রিন টাইম (মোবাইল, টিভি) নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখা।

WHO স্পষ্টভাবে বলছে— শিশুদের স্থূলতা প্রতিরোধে পরিবার ও সমাজের যৌথ ভূমিকা অপরিহার্য।

IAP গাইলাইন: ভারতীয় শিশুদের জন্য বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি

Indian Academy of Pediatrics (IAP) অনুযায়ী—

প্রতি বছর শিশুদের BMI মূল্যায়ন করা উচিত।

স্থূলতা একটি chronic disease, যা দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন।

বাড়ছে—যা ভবিষ্যতে বড় বিপদের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

প্যাকেটজাত খাবার: “স্বাদের ফাঁদে” লুকিয়ে থাকা বিপদ

প্যাকেটজাত খাবার কেন এত ক্ষতিকর?

১. অতিরিক্ত চিনি: চকলেট, কোন্ড ভিক্‌স, প্যাকেট জুস—এসব খাবারে থাকে

“hidden sugar”, যা শিশুর অজান্তেই অতিরিক্ত ক্যালোরি যোগ করে।

২. ট্রান্স ফ্যাট ও স্যাচুরেটেড ফ্যাট: চিপস, বিস্কুট, ফাস্ট ফুড—এসব

খাবার শরীরে খারাপ কোলেস্টেরল বাড়ায়।

৩. উচ্চ লবণ: প্রক্রিয়াজাত খাবারে অতিরিক্ত সোডিয়াম থাকে, যা ভবিষ্যতে উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়ায়।

৪. ভিট্রেশন ও উদ্বেগ: এই খাবারগুলোতে প্রয়োজনীয় ভিটামিন, মিনারেল, ফাইবার প্রায় অনুপস্থিত।

ফলে শিশু পোট ভার্গলে ও শরীর সঠিক পুষ্টি পায় না—এবং ধীরে ধীরে

স্থূলতার দিকে এগোয়।

WHO নির্দেশিকা: সুস্থ শিশুর জন্য কী প্রয়োজন?

অনলাইন খাবার ডেলিভারি বৃদ্ধি পেয়েছে।

অভিভাবকদের ব্যস্ততার কারণে “ready food”—এর উপর নির্ভরতা বাড়ছে।

শিশুদের খেলাধুলার সময় কমে গেছে।

এই সমস্তু কারণ মিলে তৈরি করছে একটি “obesogenic environment”—যেখানে স্থূলতা বাড়ার প্রায় অনিবার্য।

প্রতিরোধই একমাত্র পথ: করণীয় কী?

পরিবারে: বাড়ির খাবারকে গুরুত্ব দিন।

শিশুদের জোর না করে, অভ্যাস তৈরি করুন।

একদিকে বসে খাওয়ার সংস্কৃতি গড়ে তুলুন।

খাদ্যাভ্যাসে: প্রতিদিন ফল ও সবজি অন্তর্ভুক্ত করুন।

প্যাকেটজাত খাবার সপ্তাহে সীমিত করুন।

শারীরিক কার্যকলাপ: প্রতিদিন খেলাধুলা বাধ্যতামূলক করুন।

স্ক্রিন টাইম ১-২ ঘণ্টার মধ্যে রাখুন।

স্থূলে: ক্যাচিমে জাঙ্ক ফুড নিয়ন্ত্রণ।

পুষ্টিশিক্ষার অন্তর্ভুক্তি।

নীতিগত স্তরে: শিশুদের লক্ষ্য করে জাঙ্ক ফুডের বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ।

প্যাকেটজাত খাবারের লেবেলিং আরও স্পষ্ট করুন।

উপসংহার: “আজকের অভ্যাস, আগামীর স্বাস্থ্য”

শিশুর স্থূলতা কোনো বিলাসিতা নয়—এটি একটি বাড়ন্ত জনস্বাস্থ্য সমস্যা, যা এখনই গুরুত্ব সহকারে মোখা দরকার।

প্যাকেটজাত খাবারের দেখা থেকে বেরিয়ে এসে যদি আমরা আজ থেকেই সচেতন হই, তবে আগামী প্রজন্মকে একটি সুস্থ ও নিরাপদ ভবিষ্যৎ উপহার দিতে পারব।

মনে রাখতে হবে— স্থূলতা কোনো বিলাসিতা নয়—এটি একটি প্রতিরোধযোগ্য রোগ।

আর তার প্রতিরোধ শুরু হয়— পরিবারের খাবার টেবিল থেকেই।

চল্লিশের পর হাঁটুর ব্যথা? রোজকার অভ্যাসেই মিলবে সমাধান

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটুর ওপর চাপও বাড়ে। তাই চল্লিশ পেরোনার পর থেকেই কয়েকটি স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তুললে অস্টিওআর্থ্রাইটিস-সহ নানা জয়েন্টের সমস্যা অনেকটাই দূরে থাকবে।

বয়স চল্লিশের ঘরে পৌঁছালেই শরীরে নানা ধরনের পরিবর্তন দেখা দিতে শুরু করে। এর মধ্যে অন্যতম সাধারণ সমস্যা হল হাঁটুর ব্যথা। অনেকের ধারণা, হাঁটুর ব্যথা